স্মরণ

সুরজিৎ দাশগুপ্ত : প্রগতির ক্লান্তিহীন পথিক

বুলবুল আহমেদ

কেউ-কেউ তো এমন মানুষ থাকেন যারা নানা সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রিক সংকটে বন্ধুর মতো আত্মীয়ের মতো প্রিয়জনের মতো পাশে এসে বসেন। একটা ভরসার হাত বাড়িয়ে দেন। নিরাময়ের পথ দেখান। সঙ্গে করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন উত্তরণের দিকে। আমাদের যাবতীয় দ্বেষ ও ব্যর্থতা ধারণ-করে নীলকণ্ঠ হন। সুরজিৎ দাশগুপ্ত সেরকম একজন মানুষ ছিলেন। সহনাগরিকদের মধ্যে শেষ ঋষিকল্প মানুষ বলেই মনে হয় তাঁকে। আপামর বাঙালি তাঁকে মনে রাখবে হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রবক্তা হিসেবে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একজন সহৃদয় ও নিরলস কর্মী হিসেবে। ইতিহাসের একজন মোহহীন গবেষক হিসেবে। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার একটি দীপ্তিমান শিখা হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গৌরকিশোর ঘোষ, শিবনারায়ণ রায়, কাজী আবদুল ওদুদ, নজরুল, রোকেয়া, অম্লান দত্ত বা হুমায়ুন কবীর যে সমাজের কথা, সহাবস্থানের ভাবতেন সুরজিৎ দাশগুপ্তও সেই সামাজিক জীবনযাপনের চেষ্টা করেছেন কর্ম ও কথার সত্য আত্মীয়তায়।

জলপাইগুড়ি, শান্তিনিকেতন ও কলকাতায় পরিব্যাপ্ত তাঁর ছিয়াশি বছরের জীবন। শুরু ১৯৩৪ সালে এবং শেষ ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের এক তারিখে। তাঁর যাপনকথা না-আসা সময়ের নাগরিকদের কাছে আদর্শ হয়ে থাকবে, পথ দেখাবে এক স্থির প্রত্যয়ে। ছোটোবেলার কথাচারণায় বারবার উঠে আসে জলপাইগুড়ি শহর, জ্যাকসন মেডিক্যাল স্কুল। তাঁর মা অশ্রুকণা দাশগুপ্ত এই মেডিক্যাল স্কুলের প্রথম মহিলা ডাক্তার। লেডি ডাক্তার বলে জানতেন শহরের সকলে। যে কেউ পৌঁছে দিতে পারতেন নির্দিষ্ট ঠিকানায়। মা অশ্রুকণা বেড়ে উঠেছেন ঢাকা শহরের একটি সময়ের থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকা পরিবারে। অত্যন্ত প্রগতিশীল ও উদার ব্রাহ্ম পরিমণ্ডল ছিল সেখানে। পরবর্তী সময়ে তা ছাপ রেখে যাবে সুরজিৎ দাশগুপ্তের জীবনে, মায়ের থেকে উৎসারিত হয়ে। তাঁর লেখা থেকে ব্যক্তিগত কথা থেকে জেনেছি মায়ের মেডিক্যাল স্কুলের কোয়ার্টারের পাশে ছিল দরিদ্র মুসলমানদের এক বস্তি এলাকা। সামান্য দূরেই বয়ে চলেছে তিস্তা। ধরধরা ও করলা নদী ঘেরা জনপদে তিনি বেড়ে উঠেছেন। মুসলমান ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর খেলাধুলা, স্নান ও সাঁতারে বয়ে গেছে সময়। পরবর্তী সময়ে মুসলমান সমাজের পাশে থাকার পাঠ নিয়েছেন এই মেলামেশা ও উদার পারিবারিক আবহ থেকে, মনে হয়। আর কৈশোর উত্তীর্ণ একটা দীর্ঘ সময় কেটেছে শান্তিনিকেতনে অন্নদাশঙ্কর রায় ও লীলা রায়ের সান্নিধ্যে। এবং তা তাঁকে জীবন-জগৎ-সমাজকে অন্যভাবে জানার ও বোঝার এক গভীর অনুভূতিশীল মন তৈরিতে সহযোগিতা করেছে। তখনকার শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ না থাকলেও তাঁর যাপিত উদারতার রেশ ছড়িয়ে রয়েছে সবখানে, তখনও। তারপর কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের পাঠ নেবার

সময় থেকে সাহচর্য পেয়েছেন জীবনানন্দ দাশ, শিবরাম চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এইসব বুধজনের।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত কবিতা লিখেছেন। তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা কম করে ছয়খানা। শিশু-কিশোরদের জন্য সাহিত্য রচনা করেছেন। সুনীতিকুমার-শিবরাম-অন্নদাশঙ্করের জীবনী লিখেছেন। চলচ্চিত্র তাঁর অন্যতম প্যাশান ছিল। সিনেমা ও ডকুমেন্টারি পরিচালনা করে খ্যাতি পেয়েছেন। তবে তাঁর সমধিক পরিচিতি একজন মানবতাবাদীও যুক্তিশীল প্রাবন্ধিক হিসেবে। তাঁর প্রবন্ধের বইগুলির মধ্যে রয়েছে *দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ, ভারতবর্ষ ও ইসলাম, মৌলবাদ : এক নতুন সংজ্ঞা, প্রসঙ্গ : সাম্প্রদায়িকতা, ভাসকো-ডা-গামার পাঁচশ বছর, রামমোহন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ভারতীয় মুসলমানের সংকট, ক্রান্তদর্শী অন্নদাশঙ্কর, রেনেসাঁস : বিশ্বায়নের সূচনা, মৌলবাদ ও সমকাল* এছাড়াও নানা পত্র-পত্রিকা ও সংকলনের ছড়িয়ে থাকা অগ্রন্থিত অনেক প্রবন্ধ তাঁর মানস প্রবণতা ধরে রেখেছে এবং তা আগামী দিনের পাঠকদের ভাবনার খোরাক জোগাবে নিশ্চয়। তবে বিস্মৃতিপরায়ণ বাঙালির প্রতি অধিক আস্থা রাখা দুরাশা।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত দান্তের *ডিভাইন কমেডি* পড়েন শান্তিনিকেতন থাকতে। গ্যেটের *ফাউস্ট* পড়া হয় ওখানে। তারপর জার্মান ভাষা শেখেন। আর জীবনানন্দ দাশের উপদেশে পড়েন আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের জয়েস প্রমুখের লেখা। শান্তিনিকেতনে থাকতেই তিনি দান্তে, গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ তিন ভাষার তিন মহাকবিকে নিয়ে একটা বই লেখার পরিকল্পনা করেন। তারই ফসল *দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ* বইটি। জয়েসও তাঁর প্রিয়। *পোর্ট্রেট অফ অ্যান আর্টিস্ট, ইউলিসিস* পড়ে মুগ্ধ হন এবং পাঠ-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় প্রবন্ধের এবং তা সংকলিত *প্রবন্ধ- সংকলন*-এ। *ভারতবর্ষ ও ইসলাম* প্রকাশিত ১৯৯১ সালে যদিও এর পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন দার্জিলিঙে থাকতে। বলা চলে রমেশচন্দ্র মজুমদারের একটি ইসলাম বিদ্বেষের প্রতিবাদে। ভারতবর্ষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিন্যাসে ইসলাম এক অমোচনীয় প্রভাব রেখেছে। কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো ব্রিটিশের কৃপাধন্য ঐতিহাসিকরা নানাভাবে তা খাটো করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন বারবার। আর এটা তো ঠিক যে, একটা জাতি বা সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি তার ইতিহাস বিকৃত করে দেখানো বা তা ভুলিয়ে দেওয়া। আমরা দেখেছি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যযুগের বাংলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রমেশ মজুমদার মন্তব্য করেছিলেন— বাংলায় মুসলিম প্রভাব বলতে পাঁচ/ছয়টি আরবি-ফারসি শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই। এর থেকে ভয়ংকর মিথ্যাচার আর হতে পারে না। সেই পরম্পরা আজও চলেছে অনেক ক্ষেত্রে ভিন্নতর প্রসঙ্গে। দার্জিলিঙে রমেশ মজুমদারের সঙ্গে দেখা হলে তিনি এক দীর্ঘ তর্কে জড়িয়ে পড়েন। বেলা গড়িয়ে যাওয়া সেই তর্ক প্রায় মিথ হয়ে আছে, সেদিন যাঁরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁদের কাছে। এই গ্রন্থে সুরজিৎ দাশগুপ্ত ভারতবর্ষে মুসলিম আগমন ও সমাজ-জীবনে তার প্রভাব ও কারণ বিষয়ে অনেক নতুন কিন্তু যৌক্তিক তথ্য উপস্থাপন করেছেন প্রমাণসহ। ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা বিস্তার প্রসঙ্গে তিনি লেখেন— 'ব্যাপারটা বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে যে, যখন ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের হাতে সত্যিই

অনেক শক্তি ছিল, তখন ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যায় লঘু ছিল।' প্রায় সাতশো বছর ধরে মুসলিমরা দিল্লি থেকে ভারতবর্ষ শাসন করলেও খোদ দিল্লি কোনোদিনও মুসলিম প্রধান হয়নি। অথচ ক্ষমতায় থাকার দৌলতে তাদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার কথা ছিল। তবুও অস্ত্রের জোরে ইসলাম প্রচারের কুনাট্য আজও গেল না। তিনি লক্ষ করেছেন, 'যখন বাংলার শহর এলাকায় হিন্দুরা এক নতুন উত্থান ও জাগরণের চেতনায় ও গৌরবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, এই ঘটনাকালেই গ্রামাঞ্চলে বাঙালি মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার গৌরব অর্জন করে।' বলপ্রয়োগে ইসলাম প্রচারের তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন—'প্রথমেই আসে বলপ্রয়োগে ধর্ম প্রচারের তাৎপর্য ও তা হৃদয়ঙ্গমের প্রশ্ন। যদি অস্ত্রের সাহায্যেই বা বলপ্রয়োগেই ইসলাম ধর্ম প্রচার হয়ে থাকে, তাহলে মুসলিম শক্তির প্রধান কেন্দ্র থেকে এত দূরে বাংলাতেই ইসলাম ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করল কী করে? বলপ্রয়োগে ধর্ম প্রচারের তত্ত্ব সত্য হলে মুসলিম শক্তির প্রধান কেন্দ্র দিল্লির সংলগ্ন অঞ্চলগুলোতে ইসলামের অধিকতর প্রতিষ্ঠা হওয়াই উচিত ছিল নাকি? বাংলার ক্ষেত্রে গৌড় ও ঢাকার শহরাঞ্চলেই ইসলামের জনপ্রিয় হওয়ার কথা নয় কি? কিন্তু কার্যত তা হয়নি। অনেকে মনে করেন, নবাব-সুলতানদের দরবারে ও দপ্তরে উচ্চপদ পাওয়ার লোভেই জনসাধারণের একটা অংশ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এটাই যদি সত্যি হয়, তাহলে দিল্লির সংলগ্ন অঞ্চলেই মুসলিমদের সংখ্যা বেশি হওয়া উচিত ছিল, কেননা সেখানেই উচ্চপদের সংখ্যা ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। সুতরাং উচ্চপদের প্রলোভন ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রধান কারণ হতে পারে না।' এমন কথা সৈয়দ মুজতবা আলীও লিখেছেন তাঁর *ভবঘুরে ও অন্যান্য* বইয়ের 'বাংলাদেশ' নামের প্রবন্ধে, তবে অনেক সরস ভঙ্গিতে। ইতিহাসবিদ রমেশ মজুমদারের বিপরীতে গিয়ে সুরজিৎ দাশগুপ্ত লেখেন—'উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ব্রাহ্মণের অত্যাচার থেকে অব্যাহতির আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দু নেতারা নিজেদের ধর্মকে যতটা উদার বলে প্রচার করেন, হিন্দু ধর্ম যে সত্যই ততটা উদার নয়, এর উদারতা বহুলাংশে প্রচারসর্বস্ব, তার প্রমাণ নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের আচরণেই মেলে।' ঐতিহাসিক অশীন দাশগুপ্ত তাঁর *বিষয় ইতিহাস এবং অন্যান্য বিষয়* বইতে একটি হিন্দুধর্মবিষয়ক প্রবন্ধে বলেছেন—বর্ণভেদ বাদ দিলে হিন্দুধর্মের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যেন আমরা সুরজিৎ দাশগুপ্তরই কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। আর ক্ষিতিমোহন সেন *জাতিভেদ* গ্রন্থে হিন্দুধর্মের বর্ণ-কেন্দ্রিক আচার ও নিষ্ঠুরতার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন যা ভাবলে আজকেও শিউরে উঠতে হয়। তাছাড়া নানান কুসংস্কার চালু রয়েছে ধর্মের নামে।

অনেকেই বাংলায় ইসলামের আগমনের সঙ্গে তুর্কি বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের ঘটনা গুলিয়ে ফেলেন। ভুলে যান বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রসারে সুফি-সাধকদের মরমী অবদানের কথা। তারা ভুলে যায় যে, শাসক রূপে আসার আগে এখানে মুসলমানরা আসে বণিক বেশে এবং তাঁদের অনেকেই ছিলেন বিনা বেতনের মিশনারি। রিচার্ড এম ইটনের *Rise of Islam in Bengal Frontier* বইতে এর অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা রয়েছে। আর সুরজিৎ দাশগুপ্ত জানালেন— আরব বণিকরা বা মূলত শেখ সম্প্রদায় যুদ্ধবিগ্রহ বা রাজ্য জয়ের চেয়ে বাণিজ্যিক তৎপরতায় অধিক আগ্রহী ছিল। তারা যেমন আরব সাগরবর্তী বিভিন্ন

ভারতীয় বন্দর ও সিংহলে পত্তনি পেতেছিল, তেমনই বঙ্গোপসাগর দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পথে চট্টগ্রাম বন্দরে ঘাঁটি গড়ে তোলে। আস্তে আস্তে হিন্দু বণিকদের কাছে আরব বণিকরা স্বীকৃতি পেল। সমাজপতিদের ভয়ে যারা ঘরের কোণে জীবনমৃত অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করছিল, তাদের ওই আরবরা ডাকল সমুদ্রে, আশ্বাস দিল, সাহস দিল, জোগাল নতুনভাবে বাঁচার প্রেরণা। দিল নতুন ধর্মের আশ্রয়, দিল আত্মবিস্তার ও আত্মবিশ্বাসের অধিকার, সামাজিক স্বীকৃতি ও সক্ষমতার প্রতিশ্রুতি। যাদের রক্তে ছিল পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত সমুদ্রের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ, তারা পরম উৎসাহে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল কাতারে কাতারে।' বলা প্রয়োজন সে সময় একজন হিন্দু অন্যদের সঙ্গে মেলামেশার কারণে ধর্মচ্যুত হত তার অনিচ্ছা থাকলেও। মনে রাখা দরকার, পদ্মার এপারের মুসলমানদের মধ্যে তুর্কি, আফগান, পাঠান ও মুঘল রক্ত যতটা মিশেছে; পূর্ব পারের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ততটা হয়নি। সেখানে আরব বণিকরা স্থায়ীভাবে বসবাস করেনি, রাজত্ব করেনি। বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছেও কম। তুর্কিরা যখন বাংলায় এল তাদের তেমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হয়নি। সাধারণ মানুষের কাছে ততদিনে ইসলামের সামাজিক সাম্যের মর্মবাণী পৌঁছে গেছে।

প্রসঙ্গ : সাম্প্রদায়িকতা গ্রন্থে সুরজিৎ দাশগুপ্তের দৃষ্টি পড়েছে ভারত উপমহাদেশের আরেক গভীর গভীরতর ব্যাধির দিকে যার নাম সাম্প্রদায়িকতা; যার নাগপাশ আজও আমাদের মুক্তি ঘটেনি। এদেশে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভেদাভেদ ও বিদ্বেষ নিয়ে লেখালেখি, আলোচনা ও কথাবার্তা কম হয়নি। এদেশে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভেদাভেদ ও বিদ্বেষ নিয়ে লেখালেখি, আলোচনা ও কথাবার্তা কম হয়নি। তা নিরসনে চেষ্টাও কম হয়নি। সেতু-বাঁধার কাজে রেজাউল করিম ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের মতো মানুষেরা অনেক শ্রম দিয়েছেন। কিন্তু আঁধার গেল না এখনও। বাংলার সহজিয়া সাধকেরা আন্তরিক আহ্বান জানালেও অবিশ্বাস ও অপরিচয় আজও পাহাড় প্রমাণ। বাংলায় হয়তো বড়ো রকমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি, তবে আমরা পরস্পরের অবস্থান সম্পর্কে উদাসীন থেকেছি। নিকটতম প্রতিবেশির খোঁজ রাখিনি এত দীর্ঘসময় পাশাপাশি বাস করেও। তবে প্রতিদিনের যাপনে যে সাম্প্রদায়িকতা রয়ে যায় তাও কম ক্ষতিকর নয়। সে ভাঙন দেখা যায় না বলে মেরামতের প্রয়াসও তেমন একটা চোখে পড়ে না। জীবন বয়ে গেছে গতানুগতিকতায়, পড়ে থাকা মানব জমিনে কর্ষণ হয়নি, স্বর্ণ সম্ভারে ভরে ওঠেনি আমাদের ভাঁড়ার। বিপন্ন হয়েছে প্রতিবেশিতা। নেহেরু তাঁর *Autobiography*-তে বলেছিলেন, এদেশের জন্য মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা অবশ্যই ক্ষতিকর কিন্তু হিন্দুর সাম্প্রদায়িকতা বেশি ধ্বংসাত্মক। পৃথিবীর সবদেশে সবকালে সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতা বেশি ধ্বংসের ক্ষমতা রাখে ঐতিহাসিক কারণেই। সুরজিৎ দাশগুপ্ত তাই এদেশের সাম্প্রদায়িক হানাহানির সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকসমাজের দিকেই আঙুল তুলেছেন। যেমন রেজাউল করিম মুসলমান সাম্প্রদায়িকদের বেশি সতর্ক করেছেন বার বার। তা নিয়ে তাঁকে কম কথা শুনতে হয়নি, ভুল বুঝেছেন অনেকেই। এই সাম্প্রদায়িক মনই একদিন দেশভাগ করেছে। দেশভাগের সূত্রপাতটাই ছিল খুব হাস্যকর। একটি সাক্ষাৎকারে সুরজিৎ দাশগুপ্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন— 'দেশভাগ একটা ট্র্যাজেডি, আরও বড়ো ট্র্যাজেডি দেশত্যাগ।

তার চেয়েও বড়ো ট্র্যাজেডি দু-দেশের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া বানানো।'

দেশের সীমান্তের কাঁটাতার তবু অতিক্রম করা যায় দেশের মানুষের মনের মধ্যে বিদ্যমান কাঁটাতার উপড়ে ফেলা কবে সম্ভব হবে তা মহাকাল জানে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা দেশভাগের মধ্য দিয়ে। ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি হল দুটি রাষ্ট্র— ভারত ও পাকিস্তান। ভারতের তখনকার কর্ণধারেরা অধিকাংশই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। আর দেশভাগ হলেও প্রচুর সংখ্যক মুসলমান রয়ে গেলেন ভারতে। দেশভাগের পর মনে করা হয়েছিল যে সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক ভাবনার অবসান হবে। তা হয়নি। বরং সাম্প্রদায়িক জটিলতা বেড়েছে জ্যামিতিক প্রগতিতে। বর্তমান ভারতে পাকিস্তানের থেকে বেশি সংখ্যক মুসলমান বাস করে এবং এ-দেশের জল-হাওয়া-অমৃতত্বে মিশে তাদের অধিকাংশই ভারতের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত। অথচ আমাদের রাষ্ট্রীয় রাজনীতি এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে অপর করে রেখেছে। অন্যদিকে ভারত-পাকিস্তানের দফায়-দফায় যুদ্ধ ও মনোমালিন্যের তীব্রতা, বাংলাদেশের জন্ম, পাকিস্তানের আক্রোশ, পরিণতিহীন কাশ্মীর সমস্যা ও সন্ত্রাসবাদ সব মিলিয়ে ভারতীয় মুসলমান সমাজকে এক নিদারুণ সংকটে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। আর এই দশা থেকে তাদের আশু মুক্তির কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। সুরজিৎ দাশগুপ্ত মরমী অথচ নিরপেক্ষ ও নিরাসক্তভাবে ভারতীয় মুসলমানের সামূহিক সংকট পর্যবেক্ষণ করেছেন।

ভারতীয় মুসলমানের সংকট-র সূচনায় সুরজিৎ দাশগুপ্ত অকপটে বলেছেন : 'আজকের পাঠকের কাছে এটা বিস্ময়কর মনে হতে পারে যে, একদা মুসলমানরা বিখ্যাত ছিল উদারতা ও সহিষ্ণুতার জন্য। মহান ইতালীয় রেনেসাঁসের ধ্রুপদী ঐতিহাসিক বুর্খহার্ট তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডের 'ধর্ম ও রেনেসাঁসের আত্মা' শীর্ষকে মুসলমানদের উদারতা, সহিষ্ণুতা ও মানবিকতা কীভাবে রেনেসাঁসকে প্রভাবিত করেছিল তার কথা লিখেছেন। ইউরোপীয় ইতিহাসের অন্যতম প্রধান প্রণেতা ফিশার তাঁর মহাগ্রন্থের প্রথমভাগে ইসলাম প্রসঙ্গে ... আরব মুসলিমদের উদারতা ও পরমতা গ্রহণশীলতা ও সভ্যতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তবে এইসব গ্রন্থ লেখা হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে। সেকালে খুব কম মনীষী ভেবেছিলেন যে, এমন সময় আসবে যখন স্যামুয়েল পি হান্টিংটন খ্রিস্টান ও ইসলাম সভ্যতার সংঘর্ষের তত্ত্বরচনা ও ব্যাখ্যা করবেন অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বোমা বর্ষণ করে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার নিদর্শনগুলি ধ্বংস করবে অথবা আফগানিস্তানের নিরীহ নাগরিকদের হত্যা করবে।'

যারা খোঁজ রাখেন তাঁরা জানেন মূর শাসনে কতটা শান্তি ও সমৃদ্ধি এসেছিল, তৈরি হয়েছিল পরমত সহিষ্ণুতার এক অনন্য নজির। সেখানকার ইহুদিরা খ্রিস্টানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল এবং তারা মুসলমানদের স্বাগত জানিয়েছিল। এম এন রায় তাঁর বিখ্যাত *ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান* বইতে তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সাম্য, ইহজাগতিকতা ও উদারতার কথা কুণ্ঠাহীন স্বীকার করেছেন।

অনুভূতিশীল সচেতন মানুষ মাত্রেই জানেন ধর্মীয় মৌলবাদের সূচনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তারই সমকালে ভারতীয় আর্য চেতনার মোড়কে গুজরাটি-পাঞ্জাবি-মারাঠি সমাজে হিন্দু জাতীয়তাবাদের জন্ম। আর এ সম্পর্কে লেখক মত ব্যক্ত করেছেন— 'ধর্মীয় জাতীয়তাবাদই

হচ্ছে মৌলবাদ যা আপাতদৃষ্টিতে অতীতের অভিমুখী হলেও আসলে ধনতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থারই পরিণাম। অধুনাতন সংগঠনে-সংগঠনে প্রতিযোগিতায় মত্ত, ধার্মিকতার আড়ম্বরে উৎসবে আপ্লুত, পার্থিব সাফল্যের নেশায় উত্তেজিত, ভোগবাদে নিমজ্জিত, সামরিকতায় দর্পিত, নিজগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের স্বার্থে অন্ধ সমাজ সর্বপ্রকার প্রতিযোগী, সুবিধার অংশীদার, ভিন্ন মতাবলম্বীর ও স্বতন্ত্র সত্তার নির্মূলীকরণে উদ্যত এবং ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের কাছে দারিদ্র্য নিবারণ, সমস্ত মানুষের বিকাশ ও সাম্য, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কে অহিংসা, শান্তি ও সম্প্রীতি, প্রাতিস্বিক মর্যাদা, স্বতন্ত্রতা ও সৃষ্টিশীলতা অর্থহীন। স্বভাবতই এই পরিবেশে সংখ্যায় লঘু, বিত্তে লঘু, পেশিতে লঘু পরিশীলিত বুদ্ধিজীবী যুক্তিবাদী নির্বিরোধ শান্তিপ্রিয় কোনো মানুষই নিরাপদ নয়।'

এ যেন এক সমস্যার সিন্ধু দর্শন। অন্য মত পোষণের সামান্যতম সুযোগও নেই লেখনের সঙ্গে। আর এই ধর্ষকাম প্রক্রিয়ার শিকার মুসলমানরাও হতে পারে তাতে আশ্চর্যের কিছু থাকে না।

১৯৮৫ সালে লেখককে গুজরাটের বরোদাবাসী গান্ধীবাদী হরষিত ভাই বলেছিলেন, সোমনাথ লুণ্ঠনের শোধ না হওয়া পর্যন্ত কোনো গুজরাটি শান্ত হতে পারে না। তাহলে ১৯৯২ সালে সুরাটের বর্বরতার দশবছর পরে ২০০২ সালে গোধরা পরবর্তী ম্যানুষ নিধনে ও নানা পৈশাচিক কাণ্ডে হরষিত ভাইয়ের কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। এবং অপরাধী, অপরাধে সহযোগী ও অপরাধের মানসিক সমর্থক ও হত্যার হিংস্রতায় বিশ্বাসী বিশাল এক ভারতীয় সমাজ গড়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে কেবল সংকটে মুসলমানরা নয়, সংকট সমস্ত ধর্মের দুর্বলদের, সমস্ত ধর্মের মননশীল ও মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী, শান্তিবাদী, সম্প্রীতিতে ও সত্যে বিশ্বাসী মানুষের। ধর্ম আজ মানুষের প্রধানতম পরিচয়-চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের শেষে। এক্ষণে আমরা স্মরণ করতে পারি 'ধর্মের অধিকার' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— 'ইহাতে কোনো সন্দেহমাত্র নাই যে, ধর্মের বিকারে গ্রীস মরিয়াছে, ধর্মের বিকারেই রোম বিলুপ্ত হইয়াছে এবং আমাদের দুর্গতির কারণ আমাদের ধর্মের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও নাই।' আমাদের বোধোদয় হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে আশার কথা, সমস্ত উত্তেজনার শেষে অনিবার্যভাবে আসে অবসাদ ও ক্লান্তি। এ জীবন ধীরে ধীরে বীতশোক হয়। পৃথিবী ক্যাওস থেকে কসমসে ফেরে। আমরা জানি আমাদের বিপরীত অবস্থানের দুর্জনেরা অর্থে ও অস্ত্রে আত্মরক্ষায় সমর্থ, অন্যদিকের নিরাপরাধরা নিরস্ত্র ও অধিকাংশই প্রায় নির্ধন। প্রেম ও মানবতা, সত্য ও সাহসই তাদের সম্বল। আজ দেশের সর্বত্র এক বৈরী পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ডাকিনিরা চারিদিকে বিষাক্ত নিশ্বাস ফেলছে। মানবতা আর সত্য, যুক্তি আর কাণ্ডজ্ঞান আজ ধূলিলুণ্ঠিত। সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। বিচারের বাণী শোনা যাচ্ছে না কোথাও। জনগণতান্ত্রিক পরিসরে প্রশাসন ও সরকার কেমন অবান্তর হয়ে উঠেছে। এখন আমাদের কর্তব্য অহিংসা, শান্তি, সম্প্রীতি ও শুভবোধকে বাঁচিয়ে রাখা অনেক ত্যাগের বিনিময়ে। আজ আগলভাঙা ঝড়ের রাতে পারস্পরিক বিশ্বাসের কম্পমান প্রদীপ শিখাটিকে আগলে রাখতে হবে আন্তরিক চেষ্টায় এবং সেটাই সুরজিৎ দাশগুপ্তের প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠতম এক সম্মাননা।